কালের কণ্ঠ

তারিখ . 28. MAR. 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ...

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

উপাচার্য যখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের উচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স অনুপাতে বিভাগ বেশি হওয়ায় শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। অনুমোদনবিহীন জনবল নিয়োগের ফলে বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সমস্যা তৈরি হয়। এর রেশ এখনো কাটছে না। বেশ কয়েক মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই ভাগ। শিক্ষকদের মধ্যে এক পক্ষ কর্মবিরতিতে যায় আর অন্য পক্ষ মাঠে ক্লাস নেয়। এক পক্ষ কয়েক সপ্তাহ লাগাতার অনশনরত ছিল। একমাত্র দাবি উপাচার্যের অপসারণ। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় অবশেষে রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র তাদের অনশন ভাঙান। এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা একজোট হয়েছেন। তাঁরা উপাচার্যকে প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্যে উপাচার্য দীর্ঘ প্রায় এক মাস পর ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে; যদিও দেশে সাধারণভাবে অবরোধ-হরতালে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, তবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত বন্ধই বলা চলে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এখনো হয়নি, যেখানে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন এবং বেশ কটিতে ক্লাস শুরু হয়েছে। মোটা দাগে বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম, শিক্ষকদের প্রমোশন, নিয়োগসহ যাবতীয় কাজের ভালোমন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন উপাচার্য। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বডি কাজ করে, তবে এর মূল চালিকাশক্তি অর্থাৎ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন উপাচার্য। তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা, ধারণা, কর্মদক্ষতাসহ অন্য বহু বিষয়ের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ নির্ভর করে। বাংলাদেশে যত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও তা পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন, এর অবস্থান বিভিন্ন জায়গায় হওয়া ও সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন বডিতে বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি যুক্ত থাকায় মতদ্বৈধতা ও প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নটি থেকে যায়। আমি হলফ করে বলতে পারি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রভাব বিস্তার করা যতটা সহজ, তার চেয়ে বেশি সহজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে খুব সহজে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বাইরের লোকজন যুক্ত হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দিতে পারে। এ কাজে পরিবারের সদস্যরা বাইরের লোকদের আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের বিচার করা ও ভালো চাওয়া অন্যদের প্রয়োজন রয়েছে। এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটি কোন প্রক্রিয়ায় ও কৌশলে হবে তা বিবেচনার বিষয়। ভালোমন্দের দিক ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকজনসহ অন্যরা বিবেচনা করবে; কিন্তু তা বিদ্যমান কাঠামো ও উপাচার্যকে সঠিকভাবে নির্দেশনা দিয়ে করাই ভালো। কেননা আন্দোলন করে আজকে আমরা একজন উপাচার্যকে অপসারিত করতে পারি; কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি আসবেন তিনি এমন হলে আমরা কয়জনকে অপসারণ করব! আমার ধারণা, সরকারের কৌশলও ভিন্ন। একজনকে অপসারণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অপসারণের দরজা খুলতে চাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায়-অনিয়ম হলে সবার একযোগে প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু এখানেও শিক্ষকদের মধ্যে দুই পক্ষ—উপাচার্যপক্ষ ও উপাচার্যবিরোধীপক্ষ। তারা আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও হাতাহাতিতেও লিপ্ত হয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই প্রক্রিয়ার উপাচার্য রয়েছেন। নির্বাচিত ও সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত। সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োগে আবার রয়েছে দুই ধরন। এক. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের মধ্য থেকে উপাচার্য এবং দুই. বাইরের বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকদের উপাচার্য পদে নিয়োগ। আমার জানামতে, বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন দক্ষ অধ্যাপক ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর এক ধরনের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা একেবারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকও হয়তো থাকেন না। আবার থাকলেও তাঁরা দক্ষ, অভিজ্ঞ নাও হতে পারেন। কেননা একাডেমিকভাবে ভালো শিক্ষকদের প্রশাসনিক দক্ষতা থাকবে, এমন নয়। বিভাগের চেয়ারম্যান, অনুষদের ডিনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালন করা শিক্ষকরা অভিজ্ঞ হন। তাঁদের পক্ষে উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। যেমনটি আগে বলেছি এবং এটি বাস্তব সত্য যে বিভাগীয় ও জেলা শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকেন এবং প্রভাব বিস্তার করতে চান সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন ব্যক্তি। আবার রাজনীতি এমন যে কোনো বিশেষ ইস্যু বা বিষয় নিয়ে সমস্যা হলে তা মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য আবার তাঁদেরও প্রয়োজন পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো অধ্যাপক উপাচার্য হলে তাঁর পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো মোকাবিলা করা সহজ হয়। বলছি না বাইরে থেকে আসা উপাচার্য এ কাজ করতে পারবেন না; তবে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। কাজটি সহজ হয় যখন সিনিয়রসহ সব শিক্ষক তাঁকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন।

বাইরে থেকে যিনি উপাচার্য হন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন চার বছর। এই চার বছরে সবাইকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দের বিবেচনায় কাজ করলে অনেকের মন জয় করতে পারেন। চার বছর একেবারে কম সময় নয়। কিন্তু এ সময়ে উপাচার্যের নিজস্ব কিছু দিক থাকে। যেমন, তিনি মনে করতে পারেন উপাচার্য হিসেবে নিজের পদবি বড় কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়াও একটি দিক। ঢাকায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা সহজ হয় না। রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ভাবা ও একজন শিক্ষানুরাগী দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করা। তাঁর নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইতিবাচক হলে তিনি বাইরে থেকে উপাচার্য হলে তাতে ক্ষতি কী! এর সঙ্গে সমন্বয়ের বড় নিয়ামক হলো অন্যদের উপাচার্যকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার মানসিকতা। অনির্দেশক পথ অনুসরণ করতে উপাচার্যকে বাধা দেওয়া। সহজ কথায় ভালো পরামর্শ দেওয়া। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় নিয়ামকটি কাজ করে না। আবার কোথাও কোথাও দুটিরই অভাব থাকে। ফলে উপাচার্যের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তৈরি হয় পক্ষ-বিপক্ষ। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, উপাচার্য ও শিক্ষকদের স্বার্থ এক হলে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত পথে ভালোভাবে চলতে পারে। উপাচার্য বাইরের কিংবা ভেতরের তা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় অভিন্ন স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থহীনতা। এমন হলে স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করা সহজ হয়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায় তা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভালো বলতে পারবেন। তবে আমার লেখায় বিষয়গুলোর সঙ্গে কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া অবান্তর নয়।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
neazahmed_2002@yahoo.com